Vol. 33 | No. 3 | 1990

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ধূসর পাণ্ডুলিপি-র বর্ণবৈচিত্র্য : চিত্রশিল্পের দৃষ্টিতে

Volume	33
Issue	3
Year	1990
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	কাজী মোজাম্মেল হোসেন
Published online	June 1, 1990
DOI	10.62328/sp.v33i3.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v33i3.6
Pages	157-176
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

ধূসর পাণ্ডুলিপি-র বর্ণবৈচিত্র্য : চিত্রশিল্পের দৃষ্টিতে

কাজী মোজাম্মেল হোসেন

ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬) কবি জীবনানন্দ দাশ-এর (১৮৯৯-১৯৫৪) দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে কবি জীবনানন্দ দাশ এক অবিস্মরণীয় নাম। বিংশ শতাব্দীর বিপন্ন মানবতার মুখচ্ছবি সর্বপ্রথম ধরা পড়ে কবি জীবনানন্দ দাশ-এর কবিতায়।

জীবনানন্দের শৈশব-কৈশোর-যৌবন বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের বৈশ্বিক ও দৈশিক ঘটনা প্রবাহের অভিঘাতে উদ্বোধিত। সিগমন্ড ফ্রয়েডের মনোসমীক্ষণ তত্ত্বের প্রকাশ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মানববিধ্বংসী ডামাডোল, রুশ বিপ্লবের হাঁ-অর্থক প্রতিফলন, অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রসার, অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও মুদ্রাবাজারের মন্দা, কাব্যজগতে 'ওয়েস্ট ল্যান্ড' তথা 'পোড়ো-জমি'র নঞর্থকতা নিয়ে টি. এস. এলিয়ট-এর আবির্ভাব—আশা নিরাশার এই সব দ্বৈধের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বমানসে পরিণামে নেতিবাচকতাই প্রশ্রয় লাভ করে। এই নেতি, তথা নৈরাজ্য, ব্যর্থতা ও বেদনাকে আত্মস্থ করেই কাব্যাঙ্গনে জীবনানন্দের যাত্রাশুরু। শান্ত ও সৌম্য রবীন্দ্রনাথের আশাবাদী জীবনবোধের বিপরীতে জীবনানন্দের প্রথম স্বকীয় উচ্চারণ শ্রুত হলো, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্য গ্রন্থে।

সমকালীন বিশ্বের ও দেশের সর্বোপরি যুগমানসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হতাশা-ব্যর্থতা। পরবর্তীকালে জীবনানন্দ এই নেতিবাদী অবস্থান থেকে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন আশাবাদী 'অনিমেষ আলোর বলয়ে' কিন্তু ধূসর পাণ্ডুলিপি-র কালে যুগমানস-সম্ভূত নৈরাশ্য ও নৈরাজ্যের তিনি কাব্যরূপকার। যুগের এই নৈরাজ্য ধূসর-রঙের বর্ণপ্রতীকে প্রতীকায়িত হয়ে নাম গ্রহণ করেছে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'।

জীবনানন্দ দাশ আধুনিক কবিদের কবি। কবিতা লিখলেই তা যেমন কবিতা হয় না, তেমনি যিনি কবিতা লেখেন তাকেও আমরা সর্বদা কবি বলে আখ্যায়িত করতে পারি না। কবির সংজ্ঞা জীবনানন্দ দাশ নিজে যেমনি দিয়েছেন তা হল—"সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি; কবি কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য বিকীরণ তাদের সাহায্য করেছে। সাহায্য করেছে, কিন্তু সকলকে সাহায্য করতে পারে না, যাদের হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভিতরে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সারবত্তা রয়েছে তারাই সাহায্য প্রাপ্ত হন; নানা রকম চরাচরের সম্পর্কে এসে তারা কবিতা সৃষ্টি করার অবসর পায়।"[২]

শিল্পী-কবি-সাহিত্যিকরা সাধারণ মানুষ নন। তাঁদের ভাব-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা, একটু অসাধারণ। এরা নিজ কল্পনা বলে তাঁদের একান্ত ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা ও ভাব-কল্পনাকে আমাদের সম্মুখে এমন ভাবে উপস্থাপন করেন, যাতে কোন অদৃশ্য বস্তুও আমাদের দৃষ্টিতে দৃশ্যমান হয়ে ধরা দেয়।

জীবনানন্দ দাশ একজন কবিই শুধু নন। তিনি একজন সুদক্ষ শিল্পীও বটে। অনুকরণ-প্রবৃত্তি থেকে শিল্পের জন্ম। তবে যে অনুকরণে শিল্পীর মনের স্পর্শ নেই, অভিব্যক্তি নেই, তা' শিল্প হতে পারে না।

কবি জীবনানন্দ দাশ এমনি একজন শিল্পী, যিনি ছন্দময় বর্ণের মাধ্যমে 'বাহির'কে অন্তরে বন্দী করে অন্তরের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন কবিতার মাধ্যমে। দৃশ্যমান জগতে আমাদের চোখে যে রূপ-লাবণ্য ধরা পড়েনি, তা দৃশ্যমান করে, অধিগম্য করে আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরে তিনি একজন দক্ষ শিল্পীর দায়িত্ব পালন করেছেন।

জীবনানন্দে বক্তব্য এবং কাব্যরীতির স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। তাঁর এই স্বাতন্ত্র্যের দিকে লক্ষ্য রেখে নির্দ্বিধায় এ-কথা উচ্চারণ করা যায় যে, তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে এক ধ্রুব নক্ষত্র। আধুনিক

কবিদের সম্পর্কে জীবনানন্দের মন্তব্য "মানুষের মনের চিরপদার্থ কবিতায় বা সাহিত্যে মহৎ লোকদের হাতে যে বিশিষ্টতায় প্রকাশিত হয়ে ওঠে তাকেই আধুনিক সাহিত্য বা আধুনিক কবিতা বলা যেতে পারে।"[৩]

দক্ষ চিত্রকরের মত কবিতায় অজস্র রঙ ব্যবহার করে নিখুঁত অভিব্যক্তিবাদী (ইমপ্রেশনিস্টিক) চিত্রকল্প সৃষ্টির অনন্য সাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন কবি জীবনানন্দ দাশ। তাঁর কবিতার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'চিত্রময়তা'।[৪] কবির আবেগাত্মক অভিজ্ঞতার বাস্তবানুষঙ্গই ফুটে উঠেছে তাঁর বিভিন্ন কবিতার উপমা, উৎপ্রেক্ষা, প্রতীক ও চিত্রকল্পে। বিশেষত তিনি তাঁর কাব্যগ্রন্থে সূর্য, নক্ষত্র, চাঁদ, নদী, পাখী এবং নারীর মত অসংখ্য প্রতীকের মাধ্যমে সৃজন করেছেন বহু মূল্যবান ইন্দ্রিয়সংবেদনশীল চিত্রকল্প।

একজন অভিজ্ঞ অভিব্যক্তিবাদী চিত্রকর দু'ভাবে তাঁর চিত্রকর্মের সমাপ্তি টানতে পারেন। শুধু রঙ অথবা রঙ রেখা এবং ফর্ম-এর সাহায্য নিয়ে। জীবনানন্দ দাশও একজন অভিব্যক্তিবাদী কবি। তিনি তাঁর কবিতায় অসংখ্য রঙ-এর প্রতীক ব্যবহার করে তাঁর কবিতাকে একটা বর্ণময় ক্যানভাসে পরিণত করেছেন। তাঁর চিত্রকল্পে রূপ-রেখার প্রাধান্যের পরিবর্তে বর্ণ-প্রতীকের প্রাধান্যই বেশী পরিলক্ষিত হয়। সে-কারণেই জীবনানন্দ দাশ-কে বর্ণের কবি বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

অভিব্যক্তিবাদী শিল্পরীতি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে (১৮৭৪) সর্বপ্রথম ফরাসী দেশে জন্ম নেয়। "ফরাসী শিল্প বিপ্লবের ফলে শিল্পচর্চা, স্টুডিওর আবদ্ধ কক্ষের নিরূপিত আলোর সহায়তাকে অস্বীকার করে বেরিয়ে আসে উন্মুক্ত ক্ষেত্রে, সূর্যরশ্মির কম্পমান বিচিত্র আভার মধ্যে। সূর্যালোকের প্রত্যক্ষ অভিঘাতে বস্তুপুঞ্জ, প্রকৃতি ও মানুষ, বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হয়ে নানাবিধ আকৃতির জন্ম দেয়। মানুষের দৃষ্টি এ'ভাবে যে রঙ এবং আকৃতিতে সংবেদনপ্রাপ্ত হয়, চিত্রকর্মে তারই রূপায়ণ হচ্ছে অভিব্যক্তিবাদ বা ইমপ্রেশনিজম্।"[৫]

শিল্পীর দৃষ্টিতে অভিব্যক্তিবাদী তত্ত্বের সার বস্তু হল, কোন দৃশ্য দেখামাত্র শিল্পীর মনে যে মানসিক চিন্তা-চেতনা বা অনুভূতির সৃষ্টি

হয়, তার হুবহু রূপদান করা। এখানে বস্তুর বাহ্যিক আকার আকৃতির চেয়ে অভ্যন্তরীণ রূপ উদ্ঘাটনই বেশী প্রাধান্য পায়। এ-রীতিতে উপকরণের খুঁটি-নাটি বাদ দিয়ে ছবির বিষয়বস্তুর আকার সংক্ষেপ করা হয়। এবং ছবিতে এক রঙ দিয়ে কাজ করার রীতির পরিবর্তে সরাসরি রঙ ব্যবহারের রীতি প্রবর্তিত হয়। তুলির গতিময় দীর্ঘ রেখার পরিবর্তে ছোট ছোট আঁচড় ব্যবহার হতে থাকে এবং ম্লান-রঙ ব্যবহার না করে, উজ্জ্বল রঙ পাশাপাশি সাজিয়ে ছবিকে প্রাণবন্ত করার রীতি এ-আন্দোলন থেকে শুরু হয়। দীর্ঘ দিনের ব্যবহৃত প্রিয় রঙ কালো, এ-সময় থেকে বাদ পড়ে। কারণ অভিব্যক্তিবাদীদের মতে কালো মানেই সব রঙের অবলুপ্তি, আলোর নির্বাসন। এ-তত্ত্বের বদৌলতে শিল্পকলা অনেকটা বিজ্ঞানভিত্তিক হয়ে উঠে।

চিত্রকলার পরেই অভিব্যক্তিবাদী তত্ত্বের বিকাশ কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে বিস্তৃত হয়। ফলে তাঁরা বস্তুগত রূপের উপর গুরুত্ব না দিয়ে অভ্যন্তরীণ উপলব্ধিকে শব্দ-ছন্দ উপমায় ফুটিয়ে তোলার দিকে বেশী ঝুঁকে পড়েন। অর্থাৎ বাহ্যিক রূপ-লাবণ্যের পরিবর্তে মানবমনের চরমতম অনুভূতি বা অবস্থাকে ফুটিয়ে তোলাই তখন তাঁদের প্রধান দায়িত্বে পরিণত হয়। ফলে অভিব্যক্তিবাদী সাহিত্যে রূপ-কল্পনার পরিবর্তে স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রাধান্য অর্জন করে।

কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর কাব্যগ্রন্থে রঙ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বস্তুরূপের বাইরের কাঠামোকে যথাযথ রূপদানের চেষ্টা না করে, বস্তুরূপ-রঙ কবি মনে ও মননে, এক কথায় কবির অস্তিত্বের সংবেদন স্তরে যে ছাপ ফেলেছে, তা' মিলিয়ে ছবি আঁকার চেষ্টা করেছেন। তিনি ধূসর পাণ্ডুলিপি-র 'অবসরের গান' কবিতায় যে ইমপ্রেশনিস্টিক পরিচর্যার আশ্রয় নিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে অপূর্ব। এখানে কবি দিনের বিভিন্ন আলো, বিভিন্ন রঙ-এর উপমার সাহায্যে আমাদের হৃদয়ে যে বিচিত্র ইফেক্ট এবং আবেগ আনার চেষ্টা করেছেন তা অভিব্যক্তিবাদের একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত :

(ক) "মাঠের ঘাসের গন্ধ বুকে তার,—চোখে তার শিশিরের ঘ্রাণ,"

(খ) "বিকেলের আলো এসে (হয়তো বা) নষ্ট করে দেবে তার সাধের সময়!

চারিদিকে এখন সকাল—
রোদের নরম রঙ শিশুর গালের মত লাল !"

(গ) "যেই রোদ একবার এসে শুধু চ'লে যায় তাহার ঠোঁটের চুমো ধ'রে"
(ঘ) 'মাঠে মাঠে ঝ'রে পরে কাঁচা রোদ—ভাঁড়ারের রস !"
(ঙ) "কার্তিকের মিঠা রোদে আমাদের মুখ যাবে পুড়ে ;"
(চ) "এসেছে বিকালবেলা তার শান্ত শাদা পথ ধরে ;"
(ছ) "দিনের আলোয় লাল আগুনের মুখে পুড়ে মাছির মতন;"

(অবসরের গান)

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় অভিব্যক্তিবাদের মত পরাবাস্তববাদের (সুররিয়ালিজম্) স্বাদও খুঁজে পাওয়া যায়। পরাবাস্তববাদের উৎস, ফরাসী চিত্রশিল্প আন্দোলন। পরে চিত্রশিল্প থেকে ফরাসী কাব্য আন্দোলনে এর সংক্রামণ ঘটে ফ্রান্স থেকে ইংল্যান্ডে। সেখান থেকে ভারতের বাংলা কাব্য সাহিত্যে এ-ঢেউ এসে আঘাত হানে বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে। বাংলা কবিতায় কবি জীবনানন্দ দাশই সম্ভবত এ-নতুন কাব্য-ধারার প্রথম সার্থক প্রবর্তক।

রঙ একটি অসাধারণ প্রকাশক্ষম শিল্প উপাদান। প্রত্যেক শিল্পীই তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অন্তঃসার থেকে রঙ-এর স্বভাব আবিষ্কার করেন এবং নিজস্ব প্রয়োগ-পদ্ধতিতে তা সুস্পষ্ট করে তোলেন। শিল্পীর প্রকাশ ক্ষমতার প্রাচুর্যের কারণেই রঙের প্রয়োগবিধি জটিল এবং অনবরত পরিবর্তনশীল।

কোন্ দৃষ্টিতে একজন কবি বা শিল্পী রঙকে দেখেন এবং তাঁর অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন, তা অঙ্কের মত হিসাব করে বলা কঠিন। শিল্পীসত্তা তাঁর উপলব্ধির একান্ত নির্জনতায় সত্যকে যে ভাবে আবিষ্কার করেন, তারই দৃশ্যগত রূপান্তর ঘটে চিত্রকর্মের বর্ণবিভার সাহায্যে।

শিল্পী দেলাক্রোয় বিশ্বাস করতেন, রঙ-এর রঞ্জনগত যে আভা তা সীমাহীন, তা কল্পনাকে সমৃদ্ধ করে, বস্তুকে নির্ণয় করে এবং তাকে অবস্থিতি দান করে, "যতই আমি রং সম্পর্কে চিন্তা করি ততই নতুন

আবিষ্কারে আমি অভিভূত হই, বিশ্বাস জাগে যে প্রতিবিম্বিত আভা দীপ্তির সারাৎসার বস্তুর মূল্যবান এবং তার নির্ণয়ে উপাত্ত।"[৬]

শিল্পী মাতিস রঙ সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন, "রঙ-এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে চিত্রের প্রকাশময়তাকে যতটা সম্ভব সফল করা"[৭]

রঙ এবং তার 'সেড'—এর বৈচিত্র্য সীমাহীন। রঙের যে কত ধরনের মিশ্রণ এবং দীপ্তিগত প্রকাশ আছে, তা হিসাবের বাহিরে। শিল্পী—কবির রঙ তৈরীর প্রচুর অবকাশ থাকায়, হৃদয়ের যে কোন সূক্ষ্মানুভূতি বা আবেগ, তাঁরা সহজেই এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারেন।

রঙের প্রতি একটু গভীর দৃষ্টি দিলে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, সব রঙেরই আছে সংবেদনশীলতা এবং রস সৃষ্টির ক্ষমতা। সূক্ষ্মতমভাবে রঙগুলোকে, তাদের অভিন্নবাদিতায় চিহ্নিত করে প্রতিটি রঙ-এর প্রতি-ক্রিয়া, বা প্রতিস্পন্দনগত পরিচয় নির্ণয় করা সম্ভব।

রঙের প্রতিক্রিয়াগত সম্পর্কের একটি তালিকা নির্মাণ করে, বিভিন্ন রঙ-এর পরিচয় তৈরী করার চেষ্টা করা হল। কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক এ-গুলো ব্যবহার করে তাঁদের আপন মনোভাব ও অভিব্যক্তি সহজে দর্শক-শ্রোতার সামনে উপস্থিত করতে পারেন।

উজ্জ্বল লাল, চিত্রকলার প্রাথমিক রঙগুলোর অন্যতম রঙ। এ-রঙ উষ্ম। সাধারণতঃ দীপ্ত এবং সুস্পষ্টতার ছাপ বয়ে নিয়ে মানুষের মনে উত্তেজনা বা উষ্মরস সৃষ্টিতে এ-রঙ সহায়ক। ঠিক তেমনি নীল (স্বচ্ছ নীল)-প্রশান্তি, মোহনীয়তা ; হলুদ (উজ্জ্বল)-উৎফুল্লতা, ধর্মীয় আবেগ, ত্যাগ; সবুজ (গাঢ়)—চিরনীরবতা; সবুজ (মলিন)—ঈর্ষা, লোলুপতা; সবুজ (পাতারঙ)—প্রাচুর্য, সজীবতা; উজ্জ্বল সোনালী হলুদ—ঐশ্বর্য, সমৃদ্ধি; নীল (মলিন)—নিরুৎসাহ; নীল (উজ্জ্বল) সততা, ন্যায়পরায়ণতা ; সাদা-পূর্ণতা, পবিত্রতা, শান্তির প্রতীক। কালো—শোক, বিষাদ; ধূসর-উদাসীনতা, দুঃখ-মলিনতা; লাল-(হাল্কা)-অহঙ্কার; রক্তিম (ভোরের আকাশ)—আশা, প্রসন্নতা; রক্তিম (ঈষৎ হরিৎবর্ণ) উৎসাহ; বেগুনী—ধৈর্য, মহত্ত্ববোধ, আবেগ, বিনয় এবং মর্যাদার ভাব প্রকাশ করে। কমলা—হৃদয়াবেগ,

কামনা; গোলাপী--প্রফুল্লতা; সিঁদুর—ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

চিত্রকলায় সাদা এবং কালো রঙকে কোন রঙের পর্যায়ে ধরা হয় না। চিত্রকলার ভাষায় এ-রঙগুলো 'নিউট্রাল' বা নিরপেক্ষ রঙ। লাল, নীল, হলুদ চিত্রকলার মূল রঙ। পরস্পরের অনুপাতের তারতম্য ঘটিয়ে, একের সাথে অন্যের সংমিশ্রণে আমরা পাই আরও বহু রঙ। তবে মিশ্র রঙের উজ্জ্বলতা প্রাথমিক রঙের উজ্জ্বলতার চেয়ে অনেক কম। আবার মিশ্র রঙের সাথে সাদা রঙ একটু বেশী পরিমাণে মিশালে মূল রঙের উজ্জ্বলতা আরও কমে ফ্যাকাশে বা ধূসর রঙে পরিণত হবে। যেমন, হলুদের সাথে বেশী পরিমাণে সাদা রঙ মিশালে তা পাণ্ডুর (ধূসর) রঙে পরিণত হয়। যেমনি সাদা এবং কালো রঙের অনুপাতের তারতম্য ঘটিয়ে মিশ্রণ করলে তা' ধূসর রঙে পরিণত হবে।

কবি জীবনানন্দের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি-র পূর্বের কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক'। আর কবির মাত্র আটাশ বছরের সার্থক ফসল 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'। এ-সময় ছিল কবির ভরা যৌবন। যৌবন কালে কবি যৌবনের গান না গেয়ে ধূসরতার প্রকাশ কেন করলেন, তা' নিয়ে সমালোচকরা সমালোচনা—মুখর।

ধূসর একটা বিবর্ণের নাম। এ শব্দ উচ্চারণে একটা মলিন, ক্ষয়িষ্ণু বেদনাক্লিষ্ট অস্থিরতা, উদাসীনতার ভাব আমাদের মনে এনে দেয়। ঠিক একই ভাবে ধূসর পাণ্ডুলিপি উচ্চারণে একটা অস্পষ্ট, বিবর্ণ পাণ্ডুলিপি'র চিত্রকল্প আমাদের সম্মুখে ভেসে উঠে—যার লেখাগুলো অস্পষ্ট, পাঠ-উদ্ধার অসম্ভব।

জীবনানন্দের প্রথম দিকের কাব্যগ্রন্থের সাথে (ঝরা পালক, ধূসর পাণ্ডুলিপি, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী) অনেক সমালোচকের গভীর প্রণয় ঘটায়। তাঁরা তাঁকে ধূসরতার কবি বলে আখ্যায়িত করেছেন। বিশিষ্ট কাব্য-সমালোচকের ভাষায়, "জীবনানন্দের কবি কল্পনার প্রধান রঙ ধূসরতা—জীবনের অচরিতার্থতার ব্যর্থতার ক্লান্তির অবসন্নতার মৃত্যুর রঙ।"[৮]

জীবনানন্দ দাশ ধূসরতার কবি—এ-উক্তি স্মরণে রেখে তাঁর কাব্যগ্রন্থ পাঠ করলে দেখব ধূসরতার আমেজ ছড়িয়ে আছে, জড়িয়ে আছে তাঁর হিম সাদা ধোঁয়ার রঙে, জ্যোৎস্নার ম্লান রঙে, পাণ্ডুর পাতায়, পোড়া-জমিতে, হেমন্তের ঝড়ে, ফ্যাকাসে পাতায়, ধূসর-মৃত্যুর-মুখে, ধূসর চালের গন্ধে, হলুদ পাতায়, মরা ঘাসে, নষ্ট সাদা শসায়, হলদে তৃণে, মাটির কর্কশ স্বাদে। ঠিক একই ভাবে তাঁর উচ্চারণে মেলে বিষণ্ণ-মলিনতার ছাপ। পচা চালকুমড়ার ছাচে, অঘ্রাণের অন্ধকারে, বিকেল বেলার ধূসরতায়, ধূসর স্বপ্নের দেশে, ম্লান ধূপের শরীরে, ধারালো কুয়াশায়, বিবর্ণ বিস্মৃত পাখায়, বিষণ্ণ ধূসরতায়, এই বিষণ্ণতার ছাপ সুস্পষ্ট।

জীবনানন্দ দাশ যে ধূসরতার কবি এর প্রমাণ হিসেবে উপরিদ্ধৃত উপাত্ত উপস্থাপন করা যায়। কিন্তু যৌবনে কেন কবি প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-মমতার পরিবর্তে, উজ্জ্বল-রঙ-এর পরিবর্তে, ধূসর রঙের প্রতি ঝুঁকে তাঁর কাব্যগ্রন্থের পটভূমি ধূসর রঙে রাঙিয়ে, বিষণ্ণ মলিন রসের সঞ্চার করলেন? কেন তাঁর যৌবনের কাব্যগ্রন্থের শিরোনামা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' হল ? এ-সব প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক।

দেশ-কাল-সমাজ-পরিবেশ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে। বিশেষ করে কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকদের উপর এর প্রভাব অনিবার্য। জীবনানন্দের কবি-প্রতিভা, কবিসত্তা এর ব্যতিক্রম নয়। তিনি যখন 'ঝরা পালক' কাব্য লিখে কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র আটাশ বছর। আর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থ লেখার সময় তাঁর বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ। সে সময়ের দেশ-কাল-সমাজ-পরিবেশ সম্পর্কে বর্তমান প্রবন্ধের ভূমিকার বক্তব্য পর্যালোচনা করলে কবির ধূসর রঙ-এর প্রতি পক্ষপাতের মূল উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে।

কাব্যাঙ্গনে জীবনানন্দের আবির্ভাবকাল বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রযুগের দীপ্ত মধ্যাহ্নে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং স্বাতন্ত্র্য-প্রয়াসী সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও নজরুল ইসলামের প্রভাবমুক্ত হয়ে আবির্ভূত হওয়ার অবকাশ স্বল্প ছিল জীবনানন্দের। গৌণতঃ রবীন্দ্রনাথ এবং মুখ্যতঃ নজরুল-মোহিতলাল মজুমদারের প্রভাব অঙ্গীভূত হয়েছে জীবনানন্দের সূচনা পর্বের কিছু কবিতায়।

জীবনানন্দ দাশ ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র এবং অধ্যাপক ছিলেন। ফলে বিশ্ব-সাহিত্য এবং চিত্রকলার প্রভাব তাঁর উপর রেখাপাত করা স্বাভাবিক। টি. এস. এলিয়ট-এর লেখা 'ওয়েস্ট ল্যান্ড' বা 'পোড়ো-মাটি'র ভাবকল্পনা এবং সমকালীন বৈশ্বিক পরিবেশ কবিকে ধূসর বর্ণের প্রতি ভীষণ দুর্বল করে তুলেছিল। তারই প্রতিফল-রূপে ধূসর পাণ্ডুলিপিতে আমরা পাই দু'টি মূল্যবান প্রসঙ্গ—নিসর্গ প্রেম এবং সময়চেতনা।

জীবনানন্দের কবিতার আঙ্গিক তাঁর একান্ত নিজস্ব। তাঁর কাব্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ঐতিহ্যচেতনার মধ্যে সুতীক্ষ্ণ সংবেদনশীলতার সংমিশ্রণ। কবি প্রকৃতিলোক থেকে উপকরণ নিয়ে, তাঁর ইন্দ্রিয় সংবেদনশীলতার, স্পর্শ-কাতরতার, শ্রুতি চেতনার স্বাদ—ইন্দ্রিয়বেদিতায় এবং শরীর চেতনায় কবিতাকে করেছেন রসঘন ও আস্বাদযোগ্য। জীবনানন্দ দাশ আধুনিক কবিদের মধ্যে সার্থক বর্ণসচেতন কবি। তাঁর কবিতায় বহুবর্ণের সার্থক প্রয়োগ বস্তুকে আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত করে তা' হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করাতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর কবিতায় রঙ-এর ব্যবহার অত্যন্ত সুন্দর। রঙ ব্যবহারে কবি এতই সিদ্ধহস্ত ছিলেন যে অনেক সাধারণ রঙ ও তাঁর হাতের স্পর্শে অসাধারণত্ব লাভ করেছে। জীবনানন্দ দাশের কবিতা পাঠে আশ্চর্য হতে হয় এই ভেবে যে, রঙ দিয়ে তিনি তাঁর কবি-মানসকে সাজিয়েছেন, না কবি-মানসকে রঙের সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কবি তাঁর কবিতায় এমন সুদক্ষতার সাথে রঙ ব্যবহার করেছেন, যার ফলে কখনো সেগুলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, আবার কখনো তা' কল্পনা-সম্ভব হয়ে আমাদের কাছে ধরা পড়েছে।

কবিতায় প্রকৃতির চিত্রাঙ্কন করতে জীবনানন্দ দাশ প্রচুর রঙ ব্যবহার করেছেন। তাঁর রঙগুলো স্থানবিশেষে সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে রঙগুলো একান্ত ভাবেই জীবনানন্দীয় রঙে পরিণত হয়েছে। এর প্রমাণ হিসেবে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্য-গ্রন্থকে উপস্থাপন করা যায়। এ-কাব্য-গ্রন্থে কবি যে সকল রঙ ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে ধূসর, সাদা, নীল, লাল, কালো, সবুজ, হলুদ, পাণ্ডুর, সোনালী, গোলাপী, বাদামী, নম্রনীল, গভীর নীল, নীলাভ, জাম রঙ, কমলা, রূপালী ইত্যাদি বিশেষ ভাবে

উল্লেখযোগ্য। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' গ্রন্থে এ-রঙগুলোর উল্লেখ থাকলেও এর যথাযথ মিশ্রণ এবং ভাব প্রকাশ খুবই অদ্ভুত এবং এর মধ্যে কবির একান্ত অনুভূতি প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

রঙ মনের কথা বলে। রঙ ব্যবহারকারী যখন তাঁর পছন্দমত রঙ ব্যবহার করে ছবি আঁকেন, বা কবিতায় উচ্চারণ করেন, এবং দর্শক-শ্রোতা-পাঠক যখন সে-রঙের অনুভূতি অনুধাবন করতে সক্ষম হন, তখনই 'রঙ যে মনের কথা বলে' এই উক্তির সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোন ব্যক্তি যদি সাদা রঙের প্রতি দুর্বল হন, তা হলে দুর্বল ব্যক্তির মনটা পবিত্র বা বয়সের পূর্ণতায় আবদ্ধ বলে ধরে নিতে হবে। ঠিক এমনি ভাবে কবিতায় ব্যবহৃত কবি জীবননান্দ দাশ-এর রঙ পর্যালোচনা করে দেখা যাক, তিনি কখন কোন্ লক্ষ্যে কি রঙ ব্যবহার করেছেন।

জীবনানন্দের ব্যবহৃত বিচিত্র রঙের মধ্যে ধূসর রঙের বহুল প্রয়োগ তাৎপর্যপূর্ণ। এ রঙটি কবি তাঁর কবিতায় কখনও সরাসরি ব্যবহার করেছেন, কখনও এর বিভিন্ন 'সেড' ব্যবহার করে আবেগ-অনুভূতির তারতম্য বা মনোভাবের বর্ণান্তরকে অভিরঞ্জিত করেছেন।

চিত্র-শিল্পী ধূসর রঙ-কে বিষণ্ণ-মলিন ভাব প্রকাশের সহায়ক রঙ হিসেবে ব্যবহার করেন। কিন্তু জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্য-গ্রন্থে ধূসরকে নানা ভাবে রঞ্জিত করে তাঁর শূন্যতাময় অথচ স্বপ্নিল অনুভূতিকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন।

ধূসর পাণ্ডুলিপি কাব্যে কবি ধূসরকে মলিনতার প্রতীক হিসেবে যে ভাবে ব্যবহার করেছেন, তার প্রমাণ নিম্ন দৃষ্টান্তে লক্ষণীয়--"চালের ধূসর গন্ধ তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরছে দু'বেলা" (মৃত্যুর আগে) / "ধূসর মৃত্যুর মুখ :— একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিল—সোনা ছিল যাহা নিরুত্তর শান্তি পায়" (মৃত্যুর আগে) / "জমিছে ধোঁয়াটে ধারালো কুয়াশা" (পেঁচা)/ "দেহে তার বিকাল বেলার ধূসরতা" (শকুন) / "ধূসর স্বপ্নের দেশে গিয়া" (মৃত্যুর আগে)/।

কবি অনেক ক্ষেত্রে তাঁর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্য-গ্রন্থে ধূসর রঙকে কেবল মাত্র মলিন ভাব প্রকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে

বিভিন্ন শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে ধূসর রঙের পরিবেশ সুন্দর উপমা প্রতীকের মাধ্যমে সার্থক ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন—

"পোড়া জমি" (নির্জন স্বাক্ষর) / "ভস্মের মতন তাই হয়ে যায় হৃদয় ফ্যাকাশে" (জীবন, সনেট-১০) / "পাণ্ডুর পাতার মত শিশিরের শিশিরে ইতস্তত" (প্রেম) / "তোমারে নিয়েছে ডেকে কোন্ দিকে জানিনিতা—হয়েছে মলিন" (১৩৩৩)/ "বাঁশ-পাতা-মরা-ঘাস—আকাশের তারা।" (পেঁচা) / "ফ্যাকাশে পাতার পরে দাঁড়ায়েছে উঠানের ঘাস" (জীবন, সনেট—৩১) / "ফ্যাকাশে মেঘের মত চাঁদের আকাশ পিছে রেখে" (অনেক আকাশ)।

এখানেই ধূসরতার প্রতি কবির পক্ষপাত-বিষয়ক আলোচনার ইতি টানলে চলবে না। ধূসরতা কবি-কল্পনার একটা স্তর, একটা পর্ব মাত্র। ধূসর বর্ণকে কবি নৈর্বস্তুক ভাব ধারায় যে ভাবে বর্ণনা করেছেন তা হল—"ধূসর মৃত্যুর মুখ" (মৃত্যুর আগে)/ "ধূসর স্বপ্নের দেশে গিয়া" (স্বপ্নের হাতে)/ "ধূসর বাতাস" (লঘু মুহূর্ত)/ "ধূম্রক্লান্ত দিক্‌হস্তিগণ" (শকুন)।

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ধূসর রঙ-এর উৎস নির্দেশনায় বুদ্ধদেব বসুর উক্তিটি অবশ্যই স্মরণীয়—"ধূসর পাণ্ডুলিপিতে আমরা যে কবিকে পেলুম তিনি সুদূর, স্বপ্নবিষ্ট, তাঁর মনোলোক যেন একটি ধূসর কোমল পরিমণ্ডল, যেখানে যাকে বাস্তব বলি তার অভাস মাত্র নেই, কিন্তু সত্য বলে যাকে অনুভব করি তার রঙিন ছায়া পড়েছে।"[৭]

চিত্রশিল্পে সাদা রঙ সাধারণতঃ পূর্ণতা, পবিত্রতা এবং শান্তির প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় সাদা রঙকে অতি চমৎকার ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশের সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সাদা রঙকে তিনি কখনো তাঁর কবিতায় সুদূর অতীতকে বুঝানোর জন্য ব্যবহার করেছেন। কখনো ব্যবহার করছেন শুভ্রতা, পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে। আবার কখনো রোমান্টিক ভাবধারা এবং সাদার বিপরীতার্থে, পবিত্রতার পরিবর্তে বিষণ্ন ভাব প্রকাশের প্রতীক হিসেবে।

দূর-অতীতের প্রতীক হিসেবে জীবনানন্দ দাশ তাঁর ধূসর পাণ্ডুলিপি কাব্যগ্রন্থে সাদাকে ব্যবহার করেছেন এভাবে—"এ-দেশের গান নয়; গল্প নয়, দু'একটা শাদা কথা শোনো" (পরস্পর) / "মসৃণ হাড়ের মত শাদা হাত দুটি" (পরস্পর)/"হিম হাওয়া যেন শাদা কঙ্কালের হাতে" (পিপাসার গান)/ "যার চুল রূপার মতো" (যেন এক দেশলাই)/ "গভীর আকাশ আরো নীল করে দিয়ে গেছে ধবল ডানার ফেনা দিয়ে এই কি জীবন ?" (পায়রারা)।

পূর্ণতা এবং পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে সাদা-কে কবি তাঁর কবিতায় এভাবে ব্যবহার করেছেন—'এসেছে বিকেলবেলা তার শান্ত শাদা পথ ধরে"; (অবসরের গান)/"পতঙ্গের হৃদয়ের ব্যথা হব—সমুদ্রের ফেনা শাদা ফেনায় যেমন/ভেঙ্গে পড়ে ব্যথা পায়" (এই সব)/' 'ফেনার মতন তারা ঠাণ্ডা-শাদা-"(পরস্পর)/"পাথরের মত শাদা গায়ে" (পরস্পর)/"কাপড়ের মতো শাদা মুখখানা কেন" (মেয়ে)/"আমার প্রথম মেয়ে—সেই পাখি-শাদা পাখি—তারে আমি চাই" (মেয়ে)/"(ছেঁড়া ছেঁড়া শাদা মেঘ ভয় পেয়ে গেছে সব চলে/তরাসে ছেলের মত," (কার্তিক মাসের চাঁদ)।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থে কবির রোমান্টিক ভাব-পরিমণ্ডলের প্রতীক হিসেবে সাদা রঙের ব্যবহার হয়েছে এভাবে : "শাদা হাতে ধব ধবে স্তন" (পরস্পর)/"বকের ডানার সারি শাদা পদ্ম" (নদী)/"কড়ির মতন শাদা মুখ তার" (শঙ্খমালা)/"বাসমতি চালে ভেজা শাদা হাতখানা" (আমি যদি মরে যাই)।

'জীবন' কবিতায়, "শাদা হাত দুটো শাদা হাড় হয়ে মৃত্যুর খবর একবার," কবির মনে এনেছিল। এখানে সাদা রঙকে শুভ্রতার, পবিত্রতার পরিবর্তে মৃত্যুর প্রতীক হিসেবে কবি ব্যবহার করেছেন। সাদা রঙ কাফনের রঙ—বিষাদের রঙ হিসেবেও এখানে চিহ্নিত হয়েছে। "শাদা শাঁখা ধূসর বাতাসে শঙ্খের মতো কাঁদে" (তোমরা যেখানে সাধ)/ "থোরের মতন শাদা ভিজে হাত "(অশ্বত্থ বটের পথে)/"শীতরাতে মড়ার লাতের শাদা হাড়ের মতন" (সহজ)।

সবুজ তারুণ্যের রঙ। কবি নিজেও এ-রঙকে কখনো তারুণ্য, কখনো বিষাদ, কখনো প্রাণের স্বাভাবিক রঙ হিসেবে তাঁর কবিতায় ব্যবহার

করেছেন। জীবনানন্দ দাশ প্রকৃতির রূপ-রস আরও স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলার জন্য এ-রঙের অবতারণা ঘটিয়েছেন তাঁর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্য গ্রন্থে।

বাংলার আকাশ-বাতাস-নদ-মাঠ-ক্ষেতের ভালোবাসায় কবির শান্ত-সৌম্য-নির্জন হৃদয় মগ্ন ছিল। এই নিসর্গের নিবিড় সবুজ রূপ কবিকে সম্মোহিত করেছিল এ-ভাবে :

"সবুজ বনের মত উত্তরের বাতাসের হাতে" (প্রেম)/জন্মিতেছি আমি এক সবুজ ফসল।" (পিপাসার গান)/"এ-সবুজ দেশে/আর—একবার! শুনিব কি গান" (পিপাসার গান)/"প্রতিদিন ভোর আসে ধানের গুচ্ছের মত সবুজ সহজ" (মৃত্যুর আগে) /"অধীর পাতার মত পৃথিবীর মাঠে সবুজ" (অনেক আকাশ)/"সবুজ ফলায়ে যায় পৃথিবীর বুকের উপর", (জীবন, সনেট-৮)/

মলিন সবুজ ঈর্ষা, লোলুপতা এবং গাঢ় সবুজ চির নীরবতার ভাব প্রকাশ করে, কবি জীবনানন্দ দাশ ঠিক তেমনি সবুজ রঙের নানা 'সেড' ব্যবহার করে তাঁর কবিতায় বিষাদ এবং বার্ধক্যের ছাপ সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন :

"তখন সবুজ ঘাস হয়ে গেছে শাদা সব, হয়ে গেছে আকাশ ধবল" (অবসরের গান)/"শামুক গুগলিগুলো প'ড়ে আছে শ্যাওলার মলিন সবুজে"-(যদি আমি ঝড়ে যাই)/"তবু চাই সবুজ শরীরে/এ-ব্যথার সুখ।"(পিপাসার গান)/"এ সবুজ দেশে আর একবার! শুনিব কি গান" (পিপাসার গান)/"যে পাতা সবুজ ছিল—তবুও হলুদ হতে হয় (জীবন, সনেট-৪)/"দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ" (মৃত্যুর আগে)।

কখনো শান্ত-সতেজতা এবং সান্ত্বনার প্রতীক হিসেবে কবি সবুজকে তাঁর কবিতায় স্থান দিয়েছেন। জীবনানন্দ দাশের কাব্যে সবুজ জাতিস্মর স্মৃতি, সমসাময়িক বোধ এবং পুনর্জন্মকে সজীব করে তুলতে সাহায্য করেছে। সবুজ তাই কবির অশান্ত হৃদয়ে শান্তি এনে দিয়েছে কখনো কখনো। দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় :

"জীবন সবুজ হয়ে ফলে" (কয়েকটি লাইন)/ "রয়েছি সবুজ মাঠে-ঘাসে" (নির্জন স্বাক্ষর)/ "পথ ভুলে বার বার পৃথিবীর ক্ষেতে/জন্মিতেছি আমি এক সবুজ ফসল!" (পিপাসার গান)/ "অধীর পাতার মত পৃথিবীর মাঠের সবুজ/উড়ে উড়ে ঘর ছেড়ে কত দিকে গিয়েছে যে ভেসে" (অনেক আকাশ)।

সবুজ ঘাস কবির খুবই প্রিয়। জীবনানন্দ দাশের সমগ্র কাব্য গ্রন্থে 'ঘাস' নামক দু'টো কবিতা আমরা পাই। এর একটিকে কবি আন্তরিক বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি সবুজ ঘাসের মধ্যে খুঁজে পান সতেজতা এবং কোমলতার পরশ। নরম সবুজ ঘাসের মধ্যে কবি খুঁজে পান পৃথিবীর ভোরের আলো। তিনি ঘাসের মধ্যে ঘাস হয়ে জন্ম নিয়ে এর মধ্যে মাতৃত্বের স্বাদ গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আবার বিপরীতে ঘাসের বুকে লুকানো হাড় দেখে কবির হাসি পায়। তিনি এর মধ্যে দেখতে পান মৃত্যুর ছবি। দৃষ্টান্ত—

"মাঠের ঘাসের গন্ধ বুকে তার—চোখে তার শিশিরের ঘ্রাণ"
(অবসরের গান)/
"ভোর;/ আকাশের রং ঘাস ফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীল" (শিকার)/
"কচি লেবু পাতার মতো নরম সবুজ আলোয়/পৃথিবী ভরে গিয়েছে এই ভোরের বেলা;/
কাঁচা বাতাবির মতো সবুজ ঘাস—তেম্‌নি সুঘ্রাণ "(ঘাস-বনলতা সেন)/"
আমারো ইচ্ছা করে এই ঘাসের এই ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো/ গেলাসে গেলাসে পান করি," (ঘাস-বনলতা সেন)/ "ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোন এক নিবিড় ঘাস—/ মাতার শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে"
(ঘাস-বনলতা সেন)/
"মরণ তাহার দেহ কোঁচকায়ে ফেলে গেলো নদীটির পারে" (ঘাস—মহা-পৃথিবী)/
"সেই থেকে হাসায়—এ-পৃথিবীকে ঘাস/ছ-মাস গাধাকে, আর মনীষীকে মিহি ছয়মাস" (ঘাস—মহাপৃথিবী)।

যুবক কবির যৌবনে, রক্তরাগে অনেক কবিতা লাল হয়ে উঠেছে। কবির সমসাময়িক ঐতিহাসিক নিধনযজ্ঞের পরিপ্রেক্ষিতে এবং দ্বন্দ্বময়

মানসযন্ত্রণা-সংকুল অবস্থা, লাল রঙে ব্যক্ত হয়েছে তীব্র ক্ষোভের অনুভূতি। চিত্রশিল্পে লাল রঙ উন্মত্তা-উত্তেজনার প্রতীক। ভোরের আকাশের মত লাল—আশা, প্রসন্নতা এবং ঈষৎ হরিৎ বর্ণের লাল—উৎসাহের ভাব প্রকাশ করে।

জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় লাল রঙ গ্লানি এবং বিক্ষত মানসিক-তার সহযোগী হিসেবে যে ভাবে ব্যবহার করেছেন, তার উদাহরণ—

"যে কবি পেয়েছে শুধু যন্ত্রণার বিষ/শুধু জেনেছে বিষাদ, /মাটি আর রক্তের কর্কশ স্বাদ" (কয়েকটি লাইন)/তাহার বুকের রক্তে পৃথিবী হতেছে শুধু লাল!'' (অনেক আকাশ)/"তোমার রক্তের তাপ পেয়ে?" (পরস্পর)/ "সব রাঙা কামনার শিয়রে সে দেয়ালের মত এসে জাগে "(মৃত্যুর আগে)/ "এই মৃত পাখী কীট-প্রজাপতি রাঙা মেঘ—সাপের আঁধার মুখে" (এই নিদ্রা)/ "আগুনের মত/ দুপুরের রাঙা রোদ!/ আমি তবু ব্যথা দেই, /ব্যথা পাই ফিরে!" (পিপাসার গান)।

জীবনানন্দ ধূসরতার কবি বটে, তবে রোমান্টিক ভাব-ভাবনায় কবির পরিচয় অন্যভাবে ফুটে উঠে। লাল রঙের বিভিন্ন স্তরের সেড্ ব্যবহার করে তিনি তাঁর কবিতায় যে রোমান্টিক ভাবের সৃষ্টি করেছেন. তার তুলনা বিরল—

"রাঙা রোদ,—নারীর মতন/ এ-দেহ পেয়েছে যেন তার চুম্বন" (পিপাসার গান)/ "রক্তে রক্তে লাল/হয়ে গেছে বুক তার,—আহত চিতার মত বেগে/ পালায়ে গিয়েছে রোদ,—সরে গেছে আলোর বৈকাল "(জীবন-সনেট-৩)/" "আমরা দেখেছি যারা নিবিড় বটের নিচে লাল-লাল-ফল/পড়ে আছে : নির্জন মাঠের ভিড় মুখ দেখে নদীর ভিতরে;'' (মৃত্যুর আগে)/ "সে-ও এক রোদে লাল দিন,/ রোদে লাল,—সব্জীর গানে গানে সহজ স্বাধীন" (পরস্পর)/ "রোদের নরম রঙ শিশুর গালের মত লাল!" (অবসরের গান) / "রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ" (বোধ)।

আলোর রঙ লাল। তবে আলোর অনেক রূপ কবির প্রকৃতি বর্ণনায় ফুটে উঠেছে। তিনি দুপুরের রঙ কখনো মেঘ-মলিন ভেজা (হায় চিল), কখনো কমলা (আবহমান), কখনো জাফরানী (বেড়াল) রঙ-এর মতো

দেখেছেন। বিকেলের রঙ কখনো কবির কাছে 'ডিপ মেরুন' (সবিতা), হেমন্তের সন্ধ্যায় সোনার ডিমের মত চাঁদ (আমি যদি হতাম), জ্যোৎস্নাকে কখনো নম্রনীল (মৃত্যু আসে), কখনো বা হলুদ হলুদ (শব) রঙে দেখেছেন। এ-ছাড়াও কবি লাল রঙের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন অনেক ধরনের আলোর তীব্রতা। জীবনের আলো, জোনাকীর আলো, কৃত্রিম আলো—মোমের আলো, গ্যাসের আলো, সৈন্যদের মশালের আলো, রক্তিম চিতার আগুনের আলো, মোরগ ফুলের মতন লাল পাতার আগুনের আলো—প্রভৃতি।

লাল রঙের সমার্থক রঙ হিসেবে কবি রাঙা, হিঙুল, পিঙ্গল, লোহিত, কুমকুল, শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন। এ-রঙগুলোর মধ্যে কবির ক্ষোভের পরিবর্তে শান্ত ভাবটাই বেশী প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে।

নীল রঙ—প্রশান্তি, ন্যায় ও সততার প্রতীক। মলিন নীল নিরুৎসাহের ভাব প্রকাশ করে। জীবনানন্দ দাশের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্য-গ্রন্থের কবিতায় কবি যে নীল রঙ ব্যবহার করেছেন, তা তাঁর একান্ত নিজস্ব রঙ। কবির কাব্যে নীলের প্রাচুর্য অবশ্য লক্ষণীয়। কবির কাব্য দর্শনের নিগূঢ় বক্তব্য তিনি নিজস্ব ভঙ্গিতে নীলের মধ্য দিয়ে অদ্ভুত করে প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতির সাধারণ উপমায় কবি নীলকে এ-রকম ব্যবহার করেছেন—

"আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে আকাশে" (নির্জন স্বাক্ষর)/ দেখেছে যে ঐ নীল আকাশের ছবি" (পিপাসার গান) / "রয়ে যেতে যদি তুমি আকাশের নিচে,—নীল পৃথিবীর পরে" (জীবন, সনেট-৪) / "জামের ছায়ায় তুমি নীল হলে" (নদী)।

কবি-মানসের যন্ত্রণা ও দ্বন্দ্ব প্রকাশে নীল রঙ ব্যবহার করে কবি তাঁর কাব্যে এনেছেন এক অদ্ভুত প্রাণ চঞ্চলতা। যার প্রমাণ এ-ভাবে দেয়া যেতে পারে—

"কেঁদে ওঠে—চেয়ে দেখে কখন গভীর নীলে মিশে গেছে সেই সব হুন" (শকুন)/ "যত নীল আকাশেরা রয়ে গেছে খুঁজে ফেরে আরো নীল আকাশের তলে," (মৃত্যুর আগে) / "আমরা দেখেছি যারা বুনোহাঁস শিকারীর গুলির আঘাত"/ "এড়ায়ে উড়িয়া যায় দিগন্তের নম্র নীল

জ্যোৎস্নার ভিতরে" (মৃত্যুর আগে)/ "ঘুঘুদের শাদা ডানা নীল যাত্রী" (এই নিদ্রা)। জীবনানন্দ দাশের প্রথম দিকের কবিতার (আমি কবি, সেই কবি) "মৌন নীলের ইশারায় কবিপ্রাণে কামনা জেগেছে। পরবর্তীতে এই নীল রঙই কবি-প্রেয়সী রূপে ধরা দিল তাঁর কবিতায়—"রৌদ্র ঝিলিমিল্/উষার আকাশ, মধ্য নিশীথের নীল" (নীলিমা)। কবির নীলিমার স্বপ্ন ময়ূরের ডানার মত নীলাম্বর। কবিতায় কবির নীলের উপমা সকলকে মুগ্ধ করে—'সুনীল জলধি, সীমাহারা আকাশের নীল শামিয়ানা,' 'সাগর বলাকা—কিশোরের চোখে কবি দেখেছেন 'নীল নগরের স্বপ্ন,' 'আকাশে ময়ূর-নীলিমা,' "সিন্ধু"-কে উতলা করে তুলেছে আরও একবার—আর ঐ সিন্ধুর "উলঙ্গ নীল তরঙ্গে" কবি গান শুনেছেন, দেখেছেন নিঃস্ব নীল ওষ্ঠের তেতো চুম্বন।

চিত্রশিল্পের দৃষ্টিতে হলুদ উৎফুল্লতার এবং আনন্দের ভাব প্রকাশ করে: ধর্মীয় পবিত্রতা এবং বসন্তের আবেগ হলুদ রঙের মধ্যে বেশী অনুভব করা যায়। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় তুলনামূলক ভাবে নীল-এর চেয়ে হলুদ রঙের ব্যবহার একেবারে কম নয়। তবে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয়—তাঁর কবিতায় কখনো উজ্জ্বল হলুদ বা "লিমন ইয়েলোর" ব্যবহার নেই। আছে "ইয়েলো অকারের" ছড়াছড়ি। হেমন্তের পাকা ধানের রঙ "ইয়েলো অকার"। এ-রঙের মধ্যে উৎফুল্লতার চেয়ে বিষণ্ণতার ভাবই বেশী প্রকাশ পায়। এরই ফলে কবির 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' গ্রন্থের কবিতায়, হেমন্তের হলুদ রঙ ব্যবহারে, প্রকৃতিতে ধূসরতার ছাপ এনেছেন জীবনানন্দ দাশ।

হেমন্তে ধান পাকে, গাছের পাতা হলুদ হয়ে ঝরে পড়ায় অপেক্ষায় থাকে। মাঠে সবুজের সমারোহ থাকে না। ফসল কাটার শুরুও হেমন্তে। কাশবন আর হোগলার বনের পাশ কেটে বয়ে চলা নদীগুলোও যেন তখন হলুদ রঙ ধারণ করে। মনে হয়, হেমন্তের স্পর্শে প্রকৃতি যেন বয়সের ছাপ বহন করে প্রাণ-চাঞ্চল্যহীন অবস্থায় পড়ে আছে।

জীবনানন্দ দাশ কবিতায় হলুদ রঙ-কে একান্ত আপন অনুভূতিতে প্রকাশ করেছেন। তিনি হলুদকে হতাশা, আবার রোমান্টিক ভাবধারা প্রকাশের বাহন হিসেবেও বেছে নিয়েছেন। মৃত্যু এবং বিষাদের রঙ

হিসেবেও কবি হলুদকে তাঁর কাব্যে স্থান দিয়েছেন ব্যাপকভাবে। দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়—"যে-পাতা সবুজ ছিল—তবুও হলুদ হতে হয়,—" (জীবন, সনেট-৪) / "তার পর—একদিন / আবার হলদে তৃণ / ভ'রে আছে মাঠে," / (পঁচিশ বছর পরে) / "হলদে পাতার মত আমাদের পথে ওড়াউড়ি !" (জীবন, সনেট-৭)/ "হলুদ পাতার মত,—আলেয়ার বাষ্পের মতন,"—(জীবন, সনেট-২৪) / "হেমন্ত আসেনি মাঠে,—হলুদ পাতায় ভরে হৃদয়েয় বন !" (জীবন, সনেট-৭) / "হলুদ পাতার ভিড়ে ব'সে,/ শিশিরে পালক ঘ'ষে-ঘ'ষে" (পেঁচা)।

জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় অনেক সময় 'হেমন্তের হলুদ' রঙ উচ্চারণ না করে, তার পরিবর্তে পাণ্ডুর, বিবর্ণ, অসুস্থ, শুকনো, বাদামী-হলুদ—এর মত রঙ ব্যবহার করে একই বিমর্ষ-বিষণ্ণ ভাব সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন—"পাণ্ডুর পাতার মত শিশিরের—শিশিরে ইতস্তত" (প্রেম) / "ফ্যাকাশে পাতার' পরে দাঁড়ায়েছে উঠানের ঘাসে"—(জীবন, সনেট-৩১) / "পাণ্ডুর পাতার রং লাগে—তবু রক্তে তার রবে অসুস্থতা" (জীবন, সনেট-২৮)/ "পাতায় শুকনো ডাঁটে / ভাসিছে কুয়াশা" (পঁচিশ বছর পরে)।

সোনালি স্বভাবত একটি উজ্জ্বল রঙ। এ-রঙ প্রেমের রঙও বটে। জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় অন্যান্য রঙের সাথে সোনালি রঙের ব্যবহার উপমায় আনতে ভুলেন নি। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্য গ্রন্থে তিদি এ-রঙকে প্রকৃতি-প্রেম, পূর্ণতা এবং লক্ষ্মীর বর-এর প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন—"মিনারের মত মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে," (মৃত্যুর আগে) / "সোনালি উজ্জ্বল চোখে কোন্ এক ভয় যেন ঘেরে"—(পাখি)/ "ধানের সোনার কাজ ফুরায়েছে—জীবনের জেনেছে সে—কুয়াশায় খালি" (অঘ্রাণ)/ "সোনার মত ধান ফলে ওঠে যেইখানে," —(কয়েকটি লাইন)/ "ধানের সোনার ছড়া নাই মাঠে—ইঁদুর তবুও আর যাবে নাকো ঘরে" (শীত শেষে)/ "সোনালি উজ্জ্বল চোখে কোন্ এক ভয় যেন ঘেরে" (পাখী)।

রঙের বিপরীত সমাবেশ ঘটিয়ে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন বর্ণবৈভবের কবি জীবনানন্দ দাশ। চিত্রকর একটা উজ্জ্বল রঙের পাশে আর একটা

উজ্জ্বল রঙ বসিয়ে "কালার ব্যালান্স" করেন। ঠিক একই ভাবে স্নিগ্ধ রঙের পাশে স্নিগ্ধ রঙ দিয়ে সুন্দর "কালার ব্যালান্স" করা যায়। কিন্তু জীবনানন্দ দাশ, তাঁর কবিতায় এর বিপরীত সমাবেশ ঘটিয়ে নতুনত্বের স্বাদ এনেছেন। তিনি লাল রঙ এবং সোনালি রঙের পাশে গোলাপী-কমলার মত হাল্কা-সেডযুক্ত রঙ ব্যবহার করে, রঙের বিপরীত সমাবেশ ঘটিয়ে তাঁর কবিতায় সুন্দর কালার ব্যালান্স এনেছেন। উদাহরণ—

"ঘুঘুদের শাদা ডানা নীল রাত্রি—কমলারঙের মেঘ—সমুদ্রের ফেনা/রোদ-হরিণের বুকে বেদনার" (স্বপ্নের হাতে) / "গোলাপী ধূসর মেঘে পশ্চিমের বিয়োগ সে দেখে না কি ?" (এই নিদ্রা) / "সোনালি বেগুনি মেঘে যাহা কোন ফড়িঙের পতঙ্গের পাখিদের নয়" (পায়রারা) /।

অভিব্যক্তিবাদী শিল্পী আলোর প্রতিফলনের কারণে বিভিন্ন বস্তুতে বিভিন্ন রঙ প্রত্যক্ষ করেন। তাঁরা জানেন বস্তুর নিজস্ব কোন রঙ নেই। আলোর প্রতিফলনের ভিন্নতার কারণে রঙের ভিন্নতা প্রকাশ পায়।

জীবনানন্দ দাশও একজন অভিব্যক্তিবাদী শিল্পীর মত আলোর প্রতি-ফলনের ভিন্নতার কারণে প্রকৃতিতে অসংখ্য রঙ দেখেছেন। ফলে তাঁর কবিতায় যুক্ত হয়েছে অনেক অদ্ভুত কল্পনা-প্রসূত এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রঙ ; রূপালী জ্যোৎস্না, সোনালি মাছ, বিকেলের লাল রঙ, রূপার মতন চুল, মেঘ, নীলাভ খোঁপা, মেঘের অবগুন্ঠন, ম্লান নীল, জ্যোৎস্নার আলো, জামের মত ছায়ার রঙ, শকুনের মত কালো ভয়াল, বেগুনী মেঘ।

কাদম্বরীর কবি বাণভট্টের—চিত্রাঙ্কনী-প্রতিভার স্বরূপ উদঘাটন করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "রঙ ফলাইতে কবির কী আনন্দ। যেন শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই। সে রঙ শুধু চিত্রপটের-রঙ নহে, তাহাতে কবিত্বের রঙ আছে। অর্থাৎ কোন্ জিনিসের কী রঙ শুধু সেই বর্ণনা মাত্র নহে, তাহার মধ্যে হৃদয়ের অংশ আছে।"[১০] অনুরূপভাবে বর্ণপ্রেমী কবি জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থে পাই কবিত্বের রঙ, শিল্পী-হৃদয়ের রঙের সন্ধান। কবিতায় কবির রঙ ব্যবহারের কৌশলের দিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিলে এই প্রত্যয় হয় যে, অঙ্কনশিল্পের সঙ্গে জীবনানন্দের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ।

উপসংহারে এ-কথা বলা যায় যে, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-তে কবির বর্ণবোধ সার্থক এবং শিল্পগুণমণ্ডিত। তিনি তাঁর আবিষ্কৃত বর্ণের অক্ষরগত রূপ-লাবণ্য দিয়ে নিজের সমাজ-চেতনা, প্রেম-চেতনা, মৃত্যু-চেতনা এবং প্রকৃতি-চেতনার যে শিল্পমূর্তি নির্মাণ করেছেন, বাংলা কবিতার ইতিহাসে তা তুলনারহিত।

তথ্য-সঙ্কেত

১ জীবনানন্দ : অমলেন্দু বসু, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ১৯৮৪, পৃ ৭

২ কবিতার কথা : জীবনানন্দ দাশ, চতুর্থ সংস্করণ, মাঘ-১৩৮৭, পৃ ৭

৩ ঐ, পৃ ১১৮

৪ কবিতায় চিত্রকল্প—কবি জীবনানন্দ দাশ, শ্যামলকুমার ঘোষ, প্রথম প্রকাশ, ১৩৯৪, 'লেখকের নিবেদন' থেকে গৃহীত।

৫ শিল্প-বোধ ও শিল্প-চৈতন্য : সৈয়দ আলী আহসান, ১৯৮৩, পৃ ৫৯, টিকা-৪

৬ ঐ, পৃ ৫৫

৭ সৈয়দ আলী আহসান : পূর্বোক্ত, পৃ ৫৫

৮ বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড), সুকুমার সেন, পৃ ৩৬৫

৯ কালের পুতুল: বুদ্ধদেব বসু, পৃ ৩৫

১০ প্রাচীন সাহিত্য: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ ৬৬-৬৭